OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 38 - 46
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 38 - 46
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

মহাশ্বেতা দেবীর বয়ানে কবিকঙ্কণ মুকুন্দের 'বণিকখণ্ড'-এর পুনর্নির্মাণ : একটি মূল্যায়ন

ছন্দমঞ্জরী চ্যাটার্জী
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : manjareec96@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Society, Deconstruction, Reconstruction, Women, Polygamy, Female Consciousness, Protest, Patriarchy.

Abstract
The medieval period in Bengali literature is remarkable for its literary creations. The literature written in this age is so rich and varied that they have become the source for many of the modern literature. Despite their tendency of deviation the modern novelists have returned to the medieval tradition in the postcolonial period. They have realized that it's better to retreat to reach the root of human life. The duty of later modernism is to keep the currents of socio-economic and cultural aspects of Bengali life that the medieval age brought up in literature. So, the modern novelists have continued that tradition through deconstruction and reconstruction of the narratives of the middle age of Bengali literature. The novelists have recollected the universal applications of life from medieval literature and reestablished them in the light of modernity. The critical environment of the later age has merged with the social crisis of the former. Mahasweta Devi's novel 'Benebou' is a reconstruction of 'Banikkhanda' of the 'Chandimangal' kavya by Kabikankan Mukundaram Chakravarty. Mahasweta takes up the miniature of the family of banik Dhanapati victimized by the kaulinya tradition for the central theme of her novel. Time consciousness is analyzed in a new way. Society is dominated by the males until now and so time is fixed here. Mahasweta with her sharp power of observation analyses the two different forms of consciousness of two different ages. She puts emphasis on the feminist consciousness here. 'Benebou' is story a of the struggle for female rights. She presents the failure and hollowness of the restrictions of society through the interrogations of her central character Ahana. She also changes the socio-economic background, incidents and characters for the artistic recreation of the plot of her novel. Therefore 'Benebou' is not a mere retelling of the Mangalkabya tradition, but a reconstruction of the past in the context of present.

Discussion

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় 'মধ্যযুগ' নামে চিহ্নিত সময়পর্বটি সাহিত্যসৃষ্টির এক উল্লেখযোগ্য সময়পর্ব। দেশ, কাল, সমাজ ও পারিপার্শ্বিক বাস্তব জগতের প্রেক্ষাপটে রচিত এই যুগের কাব্যগুলি যেভাবে বঙ্গদেশের জীবন ও ইতিহাসের

সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেছে তা সত্যিই বিস্ময়ের। এই সকল কাব্যের মধ্যেই সুপ্ত ছিল আধুনিক সাহিত্যরীতির আঙ্গিক ও প্রকরণ। তাই একথা বলা যায় প্রাচ্যের উপন্যাস রীতির উদ্ভবও কোনো পাশ্চাত্য প্রবণতা বা পাশ্চাত্য নির্মাণ প্রক্রিয়াকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে নি। পাশ্চাত্যরীতির কিছুটা অনুসরণ করলেও উপন্যাস সাহিত্য ভিতরে ভিতরে দেশজ সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছে ও তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। উন্মেষপর্বে ঔপন্যাসিকগণ মধ্যযুগ থেকে কিছুটা সরে এলেও উত্তর-ঔপনিবেশিক কালপর্বে তাঁরা মধ্যযুগের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন, উপলব্ধি করেছেন মানবজীবনধারার শিকড়ে পৌঁছতে হলে অতীতের দিকে ফিরে যাওয়াই শ্রেয়; আর তার জন্য প্রয়োজন দুই যুগের সমন্বয়। মধ্যযুগ যেভাবে বঙ্গজীবনের ক্ষেত্র রূপে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক দিকগুলিকে লালন করে চলেছিল তা প্রবহমান রাখাই পরবর্তী আধুনিকতার কাজ। সেই জন্যই মধ্যযুগে নির্মিত আখ্যানকাব্যকে পুনর্নির্মাণ বা বিনির্মাণ করে আধুনিক ঔপন্যাসিকগণ সেই দায়িত্ব পালন করেছেন। আর এভাবেই যে আর্থসামাজিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যযুগের কাব্যগুলি রচিত হয়েছে সেই কাহিনির বীজ যুগ থেকে যুগান্তরে সঞ্চারিত হয়েছে।

ঔপন্যাসিকেরা মধ্যযুগীয় সাহিত্য থেকে বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যগুলির থেকে জীবন ও জগতের চিরন্তন আবেদনগুলিকে সংগ্রহ করলেন। আধুনিকতার আলোকে সময়োপযোগী করে উপন্যাসে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন এক নতুন প্রকরণে। ফলে একালের উপন্যাস পেল বিনির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে পুনর্নির্মাণের এক নতুন ইঙ্গিত। সেযুগের সামাজিক সংকটগুলির সাথে মিলে গেল একালের সংকটাদীর্ণ পরিমণ্ডল। এরকম পুনর্নির্মাণের মধ্য দিয়ে যে সমস্ত ঔপন্যাসিক প্রমাণ করে দেন যে মঙ্গলকাব্যগুলির সাহিত্যিক আবেদন কেবল একটি নির্দিষ্ট কালের মধ্যেই বাঁধা পড়ে নেই মহাশ্বেতা দেবী তাঁদের অন্যতম। 'বেনেবউ' উপন্যাসের ভূমিকা অংশে লেখিকা তাঁর মনোভাবকে তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন-

> "বেনেবউ" কাহিনীর মূলে আছেন ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। এই কবির কাছে আমি বারবার ফিরে ফিরে আসি। "ব্যাধখণ্ড" ও "বেনেবউ" তাঁর "চণ্ডীমঙ্গল" থেকেই উৎসারিত।"[১]

'বেনেবউ' উপন্যাসে নারীবাদী চেতনা বিকশিত হয়েছে। বিভিন্ন লেখিকার কলমেই নারীবাদীচেতনা বিকাশের ধারা লক্ষণীয় কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী এক্ষেত্রে তাঁদের থেকে কিছুটা আলাদা। তাঁর সাহিত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল তিনি তাঁর সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করেন অতীতের সাহিত্যক্ষেত্র থেকে। সেইসব সাহিত্যের নারীচরিত্রগুলির প্রতিবাদী দিকটি নতুন করে গড়ে তোলেন। তাদের জীবনসংগ্রামের কাহিনি তাঁর সাহিত্যে বেশি গুরুত্ব পায়। তাঁর 'বেনেবউ' উপন্যাসটি শুধুমাত্র 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের এক অসহায় নারীর জীবনের বেদনার্ত কাহিনি নয়, এখানে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইও প্রাধান্য পেয়েছে। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন-

> "এখনো আমরা একই সঙ্গে বিংশ শতকে ও অন্যান্য বিগত শতকে বাস করি।"[২]

এভাবেই তাঁর কলমে সময়চেতনা নতুনভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। এখনো সমাজ পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আর তাই সেই সমাজে স্থির হয়ে রয়েছে সময়। তিনি এই স্থবির সমাজের বিরুদ্ধে নারীজাগৃতির উদাহরণ দিতে গিয়ে কমলা মুখোপাধ্যায়ের কথা বলেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি যিনি নারী উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন। মহাশ্বেতা দেবী 'বেনেবউ' উপন্যাসটি তাঁকেই উৎস্বর্গ করছেন। তিনি এর মাধ্যমে পাঠককে যেন সচেতন করে জানিয়ে দিতে চেয়েছেন, যে সমাজে কমলা মুখোপাধ্যায়ের মতো নারী বর্তমান, সেই একই সমাজে অহনাকে অসহায়ের মতো পরাজিত হতে হয়; নিরপরাধ হয়েও সে সমাজের কুটিল চক্রান্তের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে না। 'বেনেবউ' উপন্যাসটি 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের 'বণিকখণ্ড'র কাহিনি অনুসরণে রচিত হয়েও কতটা সময়োচিত ও যুগানুসারী রূপে পুনর্নির্মিত হয়েছে তার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের 'বণিকখণ্ড'-এর কাহিনি হল দেবী চণ্ডীর বণিক সমাজে পূজা প্রচারের কাহিনি; আর সেই কাহিনি আবর্তিত হয়েছে বণিক ধনপতি ও তার দুই স্ত্রীর সংসার জীবনকে কেন্দ্র করে। মধ্যযুগে সেন রাজবংশ প্রবর্তিত কৌলীণ্যপ্রথার দ্বারা বঙ্গদেশে যে বিরাট সামাজিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল, বণিক ধনপতির পরিবার সেই বিপর্যস্ততার শিকার। পুরুষ বহুবিবাহ করেছে আর তার কুফল ভোগ করেছে নারী। সংসারে কার একাধিপত্য থাকবে তা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 38 - 46
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নিয়ে শুরু হয়েছে লড়াই। এই কাব্যে দেবীমাহাত্ম্য কথার অন্তরালে তাই বয়ে চলেছে নারীর অশ্রুসজল কাহিনির ফল্গুধারা। নারীমানসের অন্তর্দ্বন্দ্বকে আশ্চর্য দক্ষতায় কবি উপস্থাপন করেছেন তাঁর কাব্যে। নারী মনস্তত্ত্বের ঠিক এই অংশটিকেই মহাশ্বেতা দেবী তাঁর উপন্যাসের মূল বিষয় করে তুলেছেন। বারোটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত উপন্যাসটিতে দেখানো হয়েছে গণপতি নামক এক বণিকের একাধিক বিবাহ ঘিরে তার সংসারে কীভাবে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সংসারে নারী চায় অসপত্ন অধিকার। কিন্তু কৌলীণ্যপ্রথা তার সেই স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। সংসারে নারীর একমাত্র আশ্রয়স্থল হল তার স্বামী। সেই স্বামীকেই ভাগ করে নিতে হয়েছে আরেকজন নারীর সাথে। শুধু তাই নয়, নারী যদি হয় সন্তানহীনা তবে তার কপালে জোটে অশেষ যন্ত্রণা। সমাজে সংসারে সর্বত্র পদে পদে সে হয় অপমানিতা। উপন্যাসে গণপতির প্রথমা স্ত্রী কনকাকে সেই অপমানই ভোগ করতে হয়েছে। অন্যদিকে গণপতি যাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে সেই বালিকা অহনার জীবনে বিবাহের পর থেকেই চরম দুঃখ নেমে এসেছে। প্রথমত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে যুতে দেওয়া হয়েছে প্রাপ্তবয়স্ক গণপতির সাথে। পিতৃগৃহে আদর-যত্নে পালিত হয়েও বিবাহের ব্যাপারে তার পছন্দ অপছন্দের কোনো দাম দেওয়া হয়নি। স্বামীর ঘরে এসে সতিন কনকার আক্রোশের শিকার হয়েছে। সপত্নীর অত্যাচারে শেষপর্যন্ত জীবনযুদ্ধে হেরে গেছে সে। সমাজে সংসারে হেরে যাওয়া অহনার দুঃখগাথা নিয়েই রচিত 'বেনেবউ' উপন্যাস। মহাশ্বেতা দেবী বিশশতকের পরিবর্তিত সমাজের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে 'বণিক খণ্ড'-এর কাহিনিকে এভাবেই তাঁর উপন্যাসে উপস্থাপিত করলেন এক নব আঙ্গিকে।

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে ধনপতি সদাগরের দ্বিতীয়বার বিবাহ, বাণিজ্যের জন্য বহির্দেশে গমন ও অপরদিকে গৃহে তার দুই স্ত্রীর দ্বন্দ্ব, সপত্নী খুল্লনার প্রতি লহনার নির্মম অত্যাচারের কাহিনিকেই মহাশ্বেতা দেবী তাঁর উপন্যাসে যথাযথ ভাবে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু উপন্যাসে তিনি কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীকে উপস্থাপিত করেছেন একটি চরিত্র রূপে। তাঁর শান্তিপূর্ণ পারিবারিক জীবনের ছবি রয়েছে এখানে। চরিত্র হিসেবে মুকুন্দ 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতার চেয়ে একটু অন্যরকম। এখানে তাঁর জীবনের দুঃখ, কষ্ট বা তার দারিদ্র্যজীর্ণ পরিবারের উল্লেখ নেই। দেবী চণ্ডীর স্বপ্নাদেশের প্রসঙ্গও নেই। লেখিকা তাঁকে একজন উচ্চশিক্ষিত, আদর্শবাদী, কবিস্বভাবযুক্ত, সর্বোপরি মানবিকতাবোধ সমন্বিত এক সাধারণ কৃষিজীবি ও পূজারী ব্রাহ্মণ রূপে তুলে ধরেছেন। সে সমাজের সর্বত্র সম্মানিত এক নির্বিরোধী চরিত্র। মুকুন্দের এই নির্বিঘ্ন জীবনচর্যা ও তার শান্ত জীবনাদর্শই উপন্যাসটিকে মঙ্গলকাব্য থেকে পৃথক করেছে। ঔপন্যাসিক মুকুন্দের মাধ্যমেই উপন্যাসের মূল কাহিনিতে প্রবেশ করেছেন। প্রথম থেকেই দেখি মুকুন্দের হৃদয় অহনার দুঃখে আকুল। অহনার কান্নার কথা মনে করে সে তার স্ত্রীকে জানায়-

> "মনে হয় বই! দামিন্যা গ্রামের লক্ষ্মী যেন কাঁদছেন। যেন বিচার চাইছেন। বিচার পান না, সেই দুঃখে কাঁদেন।"[৩]

বেনেবউ অহনার কান্নায় বিষাদ ঘনিয়ে আসে তার মনে। কিন্তু সামাজিক ভাবে সে অসহায়। কুসংস্কার ও সংকীর্ণতায় পরিপূর্ণ সমাজে থেকে সে কিছু করেতে পারে না আর তাই-

> "মুকুন্দ তার অন্তরতম অন্তরের চারদিকে পাষাণের পাঁচিলে ঘিরে রাখে।"[৪]

আর বাধ্য হয় নির্বাক দ্রষ্টার মতো অহনার জীবনের করুণ পরিণতি দেখতে। উপন্যাসের শেষে মুকুন্দ বাস্তবজীবনে অহনা যা কিছু পায়নি কাব্যের মাধ্যমে সেই সমস্ত কিছু প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তার স্ত্রীকে-

> "অহনার ...সকল কথা ...আমি লিখে যাব বউ। কোনদিন তো পাঞ্চালী লিখব...তারে ইহকালে কোন সাহায্য করতে পারিনি...পাঞ্চালীতে তারে... তারে... হতভাগী বড় কষ্ট পেয়ে গেছে বউ!...বউ আস্তে বলল, পাঞ্চলীতে তারে স্বামীপুত্রও দিও। হতভাগীর বড় সাধ ছিল।
> –যদি লিখি, নিশ্চয় দিব।"[৫]

মহাশ্বেতা দেবী ষোড়শ শতাব্দীর রাজনৈতিক বাতাবরণটিকে উপস্থাপিত করেছেন 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে কবির আত্মবিবরনী অনুসরণ করে। উপন্যাসের নবম অধ্যায়ে গণপতি ও অহনার কথোপকথনে ইতিহাসের কথা উঠে আসে। গণপতি অহনাকে জানায়-

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 38 - 46
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "অন্যত্তর যাবার কথা অহনা! নানা কারণে ভাবি। সবাই বলে সেলিমাবাদ পরগনায় নতুন উজির হবে মামুদ সরিফ।"[৬]

আবার দশম অধ্যায়ে বসুভূতি, ভবভূতি, হরিহর মিশ্র, মুকুন্দ প্রমুখ আলোচনা করে যে –

> "খবর শুনছি মামুদ সরিফ আসছে উজীর হয়ে... সে কাঁচাখেগো মানুষ। ভয়ংকর অত্যাচারী। সেলিমাবাদে অত্যাচার নামবে।"[৭]

উপন্যাসের এই তথ্য মিলে যায় কাব্যের সাথে। কাব্যের প্রথমদিকেই কবির আত্মজীবনীতে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে-

"অধর্মী রাজার কালে   প্রজার পাপের ফলে
খিলাত পাইল মামুদ সরিপ।"[৮]

মামুদ সরিফের অত্যাচারে দেশের আর্থিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। খাজনা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে প্রজারা নিজের জমি- বাড়ি ত্যাগ করে পালিয়ে গিয়েছিল। কবি নিজেও এই একই কারণে বাসভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে দেবী চণ্ডী ধনীসমাজের মধ্যে তাঁর মহিমা প্রচারের জন্য উদগ্রীব হয়েছেন। কবি তাই ধনী বণিক সমাজের প্রতিনিধি ধনপতির উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন। বিত্তবান ধনপতি সপ্তডিঙা সহযোগে বিপুল বাণিজ্যপণ্যের সম্ভার নিয়ে পাড়ি দেয় সুদূর সিংহল দেশে। বিদেশে সে দেশজ বস্তু রপ্তানি করে আর সেখান থেকে নিয়ে আসে বহুমূল্য পণ্যসামগ্রী। সেইসমস্ত পণ্যের বিরাট এক তালিকা কাব্যে রয়েছে -

"সিন্দুর বদলে হিঙ্গুল পাব গুঞ্জা বদলে পলা
পাটসোন বদলে ধবল চামর কাঁচের বদলে নীলা।
চিনির বদলে দানা-কর্পূর আলতার বদলে নাঠি
সকল্লাথ পামারী কম্বল পাব বদল করিআ পাটি।"[৯]

অন্যদিকে উপন্যাসে, বণিকসমাজের অতীত গৌরব প্রায় নিশ্চিহ্ন। মধ্যযুগে বাংলায় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রবাদী সেন রাজাদের আমলে নতুনভাবে সমাজ সংগঠিত হয়েছিল। সমাজের যে সমস্ত মানুষেরা অর্থনৈতিক জীবনের সাথে সরাসরি নিযুক্ত তারা বর্ণাশ্রমের বাইরে পতিত জাতিতে পরিণত হয়েছিল। সেইকারণে সুবর্ণ ও অন্যান্য বণিকদের প্রাধান্যও লোপ পেয়েছিল। উপন্যাসে তাই দেখা যায় –

> "গণপতি বেনে। সে সপ্তগ্রাম, ফুলিয়া, শান্তিপুর থেকে কাপড় আনে, হাটে হাটে বেচে। ...গণপতির খুব সাধ, সে পুঁজি পেলে বাসন বেচবে। উৎকৃষ্ট কাঁসা, পিতল, তামার বাসনে লাভ খুব।"[১০]

এছাড়া বিভিন্ন চরিত্রের মুখে বল্লাল সেনের প্রসঙ্গ এনে বণিক সমাজের অবনতির কারণের দিকটি তুলে ধরেছেন। কখনো গণপতির মায়ের প্রসঙ্গে-

> "...সুবর্ণ বণিকদের সে দিন নেই, যে সিন্দুকে সোনা থাকবে, রাজাগজা ভয় পাবে তাকে। শুনেছেন, কোন্ বা রাজা সুবর্ণবণিকদের দবদবা সইতে পারেনি। তাদের জাতের ওপর অবিচার করেছিল।"[১১]

আবার অহনার বাবা শচীপতি তার স্ত্রীকে বলেছে,

> "বল্লালসেনই মারল আমাদেরে। নইলে ওর পূর্বপুরুষেরও নৌবহর ছিল। তাম্রলিপ্ত থেকে সুবর্ণদ্বীপ যেত। যাক গে। সকলেরই ছিল, কারোই নেই, সে কথা ভাবি না।"[১২]

এইভাবে সামাজিক অবক্ষয়ের ইতিহাসটিকে উপন্যাসে তুলে ধরে ও কাব্যে বর্ণিত বণিক সমাজের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে মহাশ্বেতা দেবী উপন্যাসে আর্থসামাজিক দিকটির পুনর্নির্মাণ করেছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 38 - 46
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উপন্যাসে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের চরিত্রগুলির নাম পরিবর্তনের পাশাপাশি সংযোজিত হয়েছে নতুন নতুন চরিত্র। কাব্যের ধনপতি, লহনা, খুল্লনা যথাক্রমে উপন্যাসে গণপতি, কনকা, অহনা এই নামে উপস্থিত। আবার খুল্লনার পিতামাতা লক্ষপতি ও রম্ভাবতী পরিবর্তিত হয়েছে অহনার পিতামাতা শচীপতি ও সতীরানীতে। লহনার সই লীলাবতী এখানে কনকার সই সরস্বতী। নতুন চরিত্র যথা মুকুন্দ ও তার পরিবার, আতাপিসি, অহনার দাদা ক্ষেমঙ্কর, নন্দরানী প্রমুখের মাধ্যমে নবনির্মাণ ঘটেছে উপন্যাসে।

চরিত্রের নাম পরিবর্তনের পাশাপাশি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের আচরণগত পরিবর্তনও লক্ষণীয়। যেমন- উপন্যাসে দুবলাদাসীর জায়গায় এসেছে আতাপিসি। কাব্যে দুবলা কেবলমাত্র দাসী কিন্তু আতাপিসি গণপতির দুঃসম্পর্কীয়া পিসি। দুবলা একজন চক্রান্তকারী। নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য সে লহনা ও খুল্লনার মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে প্রৌঢ়া আতাপিসি এক অসহায় বাল্যবিধবা ও অহনার সহমর্মী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য খুল্লনা যেখানে লহনার খুড়তুতো বোন, অহনা সেখানে কনকার দুঃসম্পর্কীয় মামাতো বোন। এছাড়া স্থানগুলিরও নামের পরিবর্তন ঘটেছে। ধনপতির বসতি উজানি নগর উপন্যাসে গণপতির দামিন্যাগ্রামে পরিণত হয়েছে। খুল্লনা ও লহনার পিত্রালয় ইছানি নগর থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে অহনার বাপের বাড়ি ত্রিনয়নীতে।

উপন্যাসে গণপতি নির্দ্বিধায় বালিকা অহনাকে বিবাহ করেছে। বিবাহে অহনাকে বারবার তার রূপের পরীক্ষা দিতে হয়েছে গণপতির কাছে। কিন্তু গণপতি পুরুষ মানুষ তাই "বেটাছেলেকে তো চেহারা পরীক্ষা দিতে হয় না। রং, চুল, চোখ, মুখ, হাতের আঙুল, পায়ের পাতা, মেয়েরা পরীক্ষা দেয়। যে কোন মেয়েকে বিয়ে করতে পারে সে।"[১৩] গণপতির মাধ্যমে যেন সমগ্র পুরুষ সমাজের মনোভাবকেই তুলে ধরা হয়েছে এখানে। অপরদিকে, অহনাকে "বারো বছর এক বউ নিয়ে ঘর"[১৪] করা পুরুষের সঙ্গে বিবাহ করতে বাধ্য করা হয়েছে। অহনা প্রথমে গণপতিকে নিয়ে খুশি হয়নি। বোন সতীনের ঘর করতে তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। বাবা শচীপতির ভুল সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাই সে মাকে জানিয়েছে -

> "বাবার মতিচ্ছন্ন হয়েছে মা! খানাকুল হতে সম্বন্ধ এল, বাবা বললেন, আমার মেয়ে মেট্যা ঘরে থাকতে পারবে না। কা-গ্রাম থেকে সম্বন্ধ এল, বাবা বললেন অতদূরে মেয়ে দিলে দেখতে যেতে পারব না। এখন কেন বা আমাকে বোনসতীনের ঘরে বুড়ো বরে দিচ্ছে?"[১৫]

মাকে প্রশ্ন করেছে অহনা কিন্তু সেই প্রশ্নের কোনো উত্তর তার মা দিতে পারেনি। মেয়ের হয়ে শুধু একবার প্রতিবাদ করতে দেখা গেছে তাকে। ফুলের মতো কোমল মেয়েকে সে গণপতির মতো দোজবরে বিয়ে দিতে রাজি নয়। স্বামী শচীপতিকে তাই বুঝিয়ে বলেছে- "বরের বয়স অনেক, দেখতে বা কি!"[১৬] প্রাণের পুতুল মেয়েকে বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা তার। স্বামীকেও সাবধান করে দিয়েছে-

> "অমন বিয়ে দেবার চেয়ে মেয়েকে নিয়ে আমি ডুবে মরব! মেয়েছেলে কি পাথর, না কাঠ? যেথা ইচ্ছা সেথা রাখবে?"[১৭]

কিন্তু তার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।

কাব্যে খুল্লনাকে সমাজের সামনে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। দেবী চণ্ডীর কৃপায় খুল্লনা উতরে গেছে সেই পরীক্ষায়। আসলে মধ্যযুগে দৈবীশক্তির উপর মানুষের বিশ্বাস ছিল অগাধ। কবিরা সেই বিশ্বাসকেই বেশি মর্যাদা দিয়েছেন তাঁদের কাব্যে। কিন্তু আধুনিক যুগ নবজাগরণের যুগ। এই যুগ দৈবীশক্তির উপর এঁকেছে প্রশ্নচিহ্ন। ঔপন্যাসিক এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

> "...একাদশ বঙ্গাব্দে ঠাকুরদেবতার কান নেই, হৃদয় নেই, ক্ষমতা নেই।"[১৮]

তাই, উপন্যাসে অহনাকে ঈশ্বর বিশ্বাসী, ভক্তিমতী ও ব্রতচারিণী রূপে দেখা গেলেও সে যখন কনকার হাতে শারীরিক ও মানসিকভাবে নিপীড়িত হয় তখন কোন দেবকৃপা বা ব্রতের ফল কাজে লাগে না। পাঁচমাসের সন্তানসম্ভবা অহনা সেই অনিয়ম, অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শেষে অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করে। গ্রামের লোকজন কনকার হাত থেকে অহনাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত অসফল হয়।

কাব্যে খুল্লনা যখন তার সপত্নী লহনার হাতে অত্যাচারিত হয়েছে সেসময় উজানি নগরের সমাজ রুখে দাঁড়ায়নি কিন্তু উপন্যাসে দামিন্যার সমাজ শেষের দিকে অহনাকে কনকার হাত থেকে বাঁচাতে ছুটে এসেছে যদিও তারা শেষ রক্ষা করতে পারে নি, অহনার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর আগে অহনা ভেবেছে –

> "হায়, শৈশব থেকে শুধু করতে নেই, বলতে নেই, নেই-নেই-নেই। ...জোরে হাসলে নিষেধ, চেঁচিয়ে দাদারে ডাকলে নিষেধ, কিছু 'খাব না' বললে বলেছ, মেয়েছেলের ও কথা সাজে না"।[১৯]

মৃত্যুর আগে অহনার এই অভিব্যক্তির প্রকাশ হয়। সে নারীজীবনের সকল নিষেধগুলির ব্যর্থতা উপলব্ধি করে। এভাবে অহনার যন্ত্রণা যেন সমগ্র নারীসমাজের যন্ত্রণা হয়ে ওঠে।

ষোড়শ শতাব্দীর সমাজে নারীরা ছিল অবহেলিত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বহুবিবাহ ছিল খুবই সাধারণ ঘটনা। তাইতো ধনপতি প্রথমা পত্নী লহনার উপস্থিতি সত্ত্বেও বিবাহ করে খুল্লনার মতো এক সরলা বালিকাকে। কাব্যে লহনা সন্তানের জন্ম দিতে না পারায় স্বামীর কাছে পেয়েছে শুধুই অপমান। স্বামী ধনপতি নির্দ্বিধায় তাকে বলেছে-

> "বাঁজি চল ঘর ছাড়ি বাঁজি চল ঘর ছাড়ি
> দশন ভাঙ্গিমু মার‍্যা পাউড়ির বাড়ি।"[২০]

যদিও খুল্লনাকে অত্যাচার করার জন্যই ধনপতি একথা বলেছে তবুও একথা মানতেই হয় যে সন্তানহীনা নারীর কোন মর্যাদাই ছিল না সমাজে। ষোড়শ শতাব্দীর সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ ঘটনা ছিল খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু বর্তমান যুগেও, নারীদের এই ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়। প্রসঙ্গত লেখিকা বলেছেন- 'বেনেবউ' এর কাহিনী সম্ভবত আজও প্রাসঙ্গিক। আইন উপেক্ষা করে এখনো সমাজে বহুবিবাহ চলছে। স্ত্রী-ত্যাগ আখছার ঘটে, ... "ছেলের মা" না হতে পারলে তো আজও বিবাহিতা মেয়েরা অপরাধী ভাবে নিজেকে...[২১]

উপন্যাসেও নিঃসন্তান কনকাকে বিভিন্নভাবে সংসারে ও সমাজে অপমানিত হতে হয়েছে-

> "শাশুড়ির গাল, আর স্বামীর হাতে চড়-চাপড়, এ ছিল কনকার নিত্য পাওনা।"[২২]

শাশুড়ি কাছে শুনেছে-

> "বাঁজি, আঁটকুড়ি। আমার ঘরে আগুন দিতে এসেছিল গা!"[২৩]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রবর্তিত বহুবিবাহপ্রথা মেয়েরা যে মুখ বুজে মেনে নিয়েছিল উপন্যাসে বিভিন্ন নারী চরিত্রের উক্তিই তার প্রমাণ। কিন্তু কনকা মন খুলে প্রথমে গণপতির দ্বিতীয়বার বিবাহে সম্মতি দিতে পারে নি। তাই ঘরে বাইরে সকলে মিলে তাকে অস্থির করে তুলেছে। কনকার দুঃখে কেউ দুঃখিত হয়নি। কেউ তার সমব্যথী হয়ে ওঠেনি। কনকা বুঝতে পেরেছে নিঃসন্তান হওয়ায় সংসারে তার আর কোন মূল্য নেই। সংসারে তার অবস্থান অনুভূতিহীন জড় পদার্থের মতোই। তাই সে প্রতিবাদ করে বলেছে- "আমি কি ঘটি বাটি, না গাছ?"[২৪] কিন্তু কনকা খুব বেশি দিন তার প্রতিবাদ জিইয়ে রাখতে পারেনি। স্বামীর ক্ষোভ দূর করতে বাধ্য হয়ে ঘরে সতিন আনতে সম্মতি দিয়েছে সে।

ঔপন্যাসিক সতিন-সমস্যাকে প্রকট রূপে তুলে ধরে দেখিয়েছেন গণপতির সংসার ছাড়াও সেদিনের সমাজে প্রত্যেক ঘরে ঘরেই এই সমস্যা ছিল। এ ব্যাপারে উচ্চশ্রেণি ও নিম্নশ্রেণির মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। গণপতির চাকর গদাইয়ের কথায় তা বেশ বোঝা যায়। গদাই বলে-

> "আমাদের ঘরে কত্তা! দুটো বউ লাগেই। একটা রাঁধে বাড়ে, অন্যটা ছেলেপিলে, গাই গরু সামলায়।"[২৫]

সপত্নী নিয়ে ঘর করা সমাজের প্রত্যেক নারী তাই পরজন্মে "একা ঘরে একেশ্বরী"[২৬] হয়ে জন্ম নিতে চেয়েছে। মধ্যযুগে কৌলীণ্যপ্রথার শিকার হয়েছে অসংখ্য নারী। অকালে বিধবা হয়ে সেইসমস্ত নারীর জীবন কতটা যন্ত্রনার মধ্যে দিয়ে কেটেছে তা ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন আতা পিসি নামক চরিত্রটির মাধ্যমে। গণপতির ঘরে আশ্রিত, সকল প্রকার সুখ থেকে বঞ্চিত এই নারীর যেন অভিযোগ রয়েছে সমাজ, সংসার এমনকি ঈশ্বরের বিরুদ্ধেও-

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 38 - 46
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "ভগবানের অবিচার আতাপিসি সদাসর্বদা দেখতে পায়। ভগবান আছে, না নেই? যদি থাকেও, আতাপিসির সঙ্গে তার মহাশত্রুতা। নইলে এক বুড়োর হাতে কন্যা সমর্পণ করে বাপ ডুমুরপুর থেকে সংসার তুলে সকন্দ গ্রাম চলে যায়?"[২৭]

বিধবা হয়ে পরের বাড়িতে দাসীবৃত্তি করে যাকে দিন কাটাতে হয়, যার নিজস্ব কোনো শখ আহ্লাদ নেই সেই আতাপিসির জন্য গণপতি যখন আলাদা ঘর বানিয়ে দেয়, তখন "জীবনে প্রথম একটা নিজের জায়গা"[২৮] পেয়ে সে খুব খুশি হয়। সে যেন প্রথমবার নিজের পৃথক অস্তিত্ব উপলব্ধি করে।

উপন্যাসে কনকার মনের অন্তর্দ্বন্দ্বকে কাব্যের লহনার থেকে কিছুটা আলাদা করে দেখানো হয়েছে। ধনপতির দ্বিতীয় বার বিবাহের কথা শুনে নিষ্ফল অভিমানই সার হয়েছে লহনার। বণিকের কপট বচন "রন্ধনের তরে আমি আন্যা দিব দাসী"[২৯] শুনে দ্রুত সম্মতিও দিয়েছে সে। আসলে লহনা ও খুল্লনার মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে দুবলা দাসী। লহনাকে বুঝিয়েছে দুবলা-

> "সাপিনী বাঘিনী সতা পোষ নাহি মানে
> অবশেষে অই তোমা বধিব পরানে।"[৩০]

লহনা তাই খুল্লনাকে দিয়ে ছাগল চরিয়ে, তাকে দীর্ঘদিন সহায় সম্বলহীন করে ঘরের বাইরে রেখে মনের জ্বালা মিটিয়েছে। অন্যদিকে উপন্যাসে কনকা প্রথম দিকে স্বামী গণপতির দ্বিতীয়বার বিবাহে বহুদিন সম্মতি দেয় নি। পরবর্তী কালে সতীন অহনাকে মেনে নিয়েছে সে। মনের কোণে যুবতী অহনার প্রতি প্রাপ্তবয়স্কা কনকার বিদ্বেষ লুকিয়ে থাকলেও তা প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু যেদিন সে অহনার মা-র দেওয়া বশীকরণের পুঁটুলি হাতে পেয়েছে সেদিন থেকেই অহনার প্রতি তার আক্রোশ আর চাপা থাকেনি –

> "অহনা, অহনা আটঘাট বেঁধে সব ব্যবস্থা করে তবে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিল। ...নিশ্চয় তার বিপদ কামনায় এই ভস্ম তৈরী হয়েছে।"[৩১]

সন্তানহীনা কনকা সংসারের সমস্ত অধিকার ভাগ করে নিয়েছিল অহনার সাথে। সেই অহনাই তাকে মারতে চেয়েছে একথা ভেবে প্রাণের ভয়ে তেগুনা গুনীনের কাছে ছুটে গেছে। তেগুনা জানিয়েছে –

> "আখুন চিন্তা লাই...কিন্তুক উয়ার পেটে বিটা এলে...সি বিটা প্যাটে পাঁচমাস, বান্যা তমারে খ্যাদা করব্যে। আর বিটা জনম লিয্যল তো তুমি মরবে..."।[৩২]

কনকা অহনাকে হত্যা করবে জানালে তেগুনা তাকে বলে- "তুমি তেখুনি মরব্যে, উয়ার আগে।"[৩৩] তাই সে অহনার উপর প্রতিদিন শারীরিক অত্যাচার করেছে। অহনাকে একেবারে মেরে ফেলতেও পারেনি আবার নিজের প্রতিশোধস্পৃহাকেও দমন করতে পারেনি। এইভাবে কনকার নারীমনস্তত্ত্বকে মহাশ্বেতা দেবী দেখিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে আর তারই সাথে 'বেনেবউ' উপন্যাসে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের সমাজ ও নারী অবমাননার দিকটিকে পুনর্নির্মাণ করেছেন।

এছাড়া কাব্যের অনুসরণে লেখিকা তাঁর উপন্যাসের মধ্যে বাংলার গ্রামসমাজ, প্রাচীন সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, সংস্কার, কুসংস্কার, লোকাচার প্রভৃতি বিষয়গুলিকে সময়োপযোগী করে উপস্থাপিত করেছেন। খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে "আদা-হিং-বেগুন দিয়ে মাগুরের ঝোল, জিরে-মৌরি বেটে কইমাছের তেল ঝোল, সুকতা, থোড় ঘন্ট, শাকভাজা"[৩৪] প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের উল্লেখ করেছেন। মধ্যযুগের মতো এখনও যা বাঙালির খাদ্যতালিকায় বিদ্যমান।

কাব্যে শুধুমাত্র চণ্ডী ও শিব পূজার উল্লেখ রয়েছে। উপন্যাসে বুড়ো শিবের মেলা, মঙ্গলচণ্ডী, শিবচতুর্দশী, লক্ষ্মীপূজা, বাস্তুপূজা, সুবচনী, হলুদষষ্ঠী প্রভৃতি ব্রতের কথাও পাওয়া যায়। কাব্যে ও উপন্যাসে উভয়ক্ষেত্রেই কুসংস্কারের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। কাব্যে যেভাবে লক্ষপতি কন্যা খুল্লনার ভাগ্য ঠিকুজি নিয়ে উদ্বিগ্ন-

> "গণক কহিল মোরে দিবে দ্বিতীয় বরে
> বিচারিএ বিধবা-লক্ষণ"[৩৫]

অনুরূপভাবে, উপন্যাসে শচীপতিও মেয়ে অহনার ঠিকুজি কোষ্ঠী নিয়ে সমভাবে উদ্বিগ্ন। সে গণকের কাছে অহনার ভাগ্যের কথা শুনে এসে স্ত্রীকে বলে,

> "দোজবরে বিয়ে হবে, সতীন থাকবে, সন্তান হবে, সুখী হবে, বৈধব্য যোগ নেই। তবে চতুর্দশ পূর্ণ হয়ে পনেরোয় যেন না পড়ে।"[৩৬]

বশীকরণ ও তুকতাকের মতো কুসংস্কারের দিকটিও কাব্যের মতো করেই ঔপন্যাসিক 'বেনেবউ' এ তুলে ধরেছেন। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে দেখি রম্ভাবতী কন্যা খুল্লনার বৈবাহিক জীবন নিরুপদ্রব করতে যেমন তুকতাকের আশ্রয় নিয়েছে, উপন্যাসে একইভাবে অহনার মা রতি হাড়িনীর পরামর্শ নিয়েছে। এছাড়া কনকাও সতিন সমস্যা দূর করার জন্য একাধিকবার ছুটে গেছে গুনিন তেগুণার কাছে। এইভাবে সমকালীন জীবনের সাথে মধ্যযুগের সমাজ ও সংস্কৃতিকে মিলিয়ে দিয়ে উপন্যাসের কাহিনিকে এক নতুন রূপ দান করেছেন।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' এর 'বণিকখণ্ড' ও 'বেনেবউ' উপন্যাসের কাহিনিকে নানাভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা গেল যে, মহাশ্বেতা দেবী তাঁর উপন্যাসের কাহিনি বয়নে 'বণিকখণ্ড'র অনুসরণ করলেও বিভিন্নভাবে তার পুনর্নির্মাণ করেছেন। উপন্যাসের ভূমিকা অংশে লেখিকা স্বয়ং বলেছেন যে মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডলে যে সমস্ত ঘটনা স্বাভাবিক ছিল বর্তমান সমাজেও তা অবলীলায় ঘটে চলেছে। প্রসঙ্গত বলেছেন স্ত্রী-ত্যাগ, পুত্রসন্তানের জননী না হতে পারার ফলস্বরূপ অবহেলার শিকার প্রভৃতি নারী নির্যাতনমূলক ঘটনা আজও সমাজে বহুল ভাবেই ঘটে। অহনার করুণ পরিণতির মধ্য দিয়ে তিনি সমাজে প্রচলিত নারীজীবনের বিভিন্ন বিধি-নিষেধগুলির ব্যর্থতা ও অন্তঃসারশূন্যতাকে অহনার মুখ দিয়েই জিজ্ঞাসাকারে উপস্থাপিত করেছেন। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তির দ্বারা মহাশ্বেতা দেবী মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের দুই ভিন্ন চেতনাকে বিশ্লেষণ করেছেন নতুন ভাবে। এছাড়াও তিনি 'বণিকখণ্ড'-এর আর্থসামাজিক পটভূমির, ঘটনাবলীর, চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে তাঁর উপন্যাসকে এক নতুন শিল্পরূপ দান করেছেন। তিনি উপন্যাসের আখ্যানে মঙ্গলকাব্যের কাহিনি অনুসরণে বাঙালি জীবনের চিরাচরিত পরম্পরাগুলির বর্তমানের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। 'বেনেবউ'-এর কাহিনি তাই মঙ্গলকাব্যের প্রথানুসরণে রচিত কাহিনিমাত্র নয়, তা হয়ে উঠেছে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে অতীতের নবনির্মাণ।

Reference:

১. দেবী, মহাশ্বেতা, বেনেবউ, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ২০১০, পৃ. ১ (ভূমিকা)
২. তদেব, পৃ. ১ (ভূমিকা)
৩. তদেব, পৃ. ৩
৪. তদেব, পৃ. ১৩
৫. তদেব, পৃ. ১৩৫
৬. তদেব, পৃ. ৯৫
৭. তদেব, পৃ. ১০৫
৮. সেন, সুকুমার (সম্পা.), কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, ২০১৭, পৃ. ৩
৯. তদেব, পৃ. ১৯৬
১০. দেবী, মহাশ্বেতা, বেনেবউ, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ২০১০, পৃ. ৩০
১১. তদেব, পৃ. ১৭
১২. তদেব, পৃ. ৫৮
১৩. তদেব, পৃ. ৩৪
১৪. তদেব, পৃ. ৫১
১৫. তদেব, পৃ. ৫১
১৬. তদেব, পৃ. ৫৬

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 38 - 46
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৭. তদেব, পৃ. ৫৬
১৮. তদেব, পৃ. ১২৫
১৯. তদেব, পৃ. ১৩৩
২০. সেন, সুকুমার (সম্পা.), কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, ২০১৭, পৃ. ১৬৯
২১. দেবী, মহাশ্বেতা, বেনেবউ, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ২০১০, পৃ. ১ (ভূমিকা)
২২. তদেব, পৃ. ১৯
২৩. তদেব, পৃ. ১৯
২৪. তদেব, পৃ. ২০
২৫. তদেব, পৃ. ৩৫
২৬. তদেব, পৃ. ৪৫
২৭. তদেব, পৃ. ৩৭
২৮. তদেব, পৃ. ২৬
২৯. সেন, সুকুমার (সম্পা.), কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, ২০১৭, পৃ. ১১৯
৩০. তদেব, পৃ. ১৩২
৩১. দেবী, মহাশ্বেতা, বেনেবউ, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ২০১০, পৃ. ১১৮
৩২. তদেব, পৃ. ১২১
৩৩. তদেব, পৃ. ১২১
৩৪. তদেব, পৃ. ৪০
৩৫. সেন, সুকুমার (সম্পা.), কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, ২০১৭, পৃ. ১১৭
৩৬. দেবী, মহাশ্বেতা, বেনেবউ, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ২০১০, পৃ. ৫৭

Bibliography:

দেবী, মহাশ্বেতা, বেনেবউ, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ২০১০
সেন, সুকুমার (সম্পা.), কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, ২০১৭
সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৫
ভট্টাচার্য, তপোধীর, প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর, ২০০৬
ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০১৫
পোদ্দার, অরবিন্দ, মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৯
রায়, বিশ্বনাথ (সম্পা.), কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল : বীক্ষা ও সমীক্ষা, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১৪
ভট্টাচার্য, প্রভাতকুমার, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর, বাকপ্রতিম, কলকাতা, ২০১৯

সহায়ক পত্রিকা

মঙ্গলকাব্য ও মঙ্গলকাব্যচর্চা, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, শারদ ২০১৬
বিশশতকের জনপ্রিয় সংস্কৃতি ও মুক্তকলা কিছু ভাবনা, সেপ্টেম্বর ২০১৬
মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা, তবু একলব্য সময়ের সংলাপ, ২০১৬